আজকের কাগজ

তারিখ 30 MAR 1995
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

উপমহাদেশে ইংরেজি শিক্ষা ও

প্রাসঙ্গিক কিছু ভাবনা

হারুন-উর-রশিদ আসকারী

নানা কারণেই ধরে নেয়া যায় যে ইংরেজি এই গ্রহের সেরা ভাষা। কাগজ-কলম কিংবা মুখে-মুখে এ ভাষার ব্যবহারের বহর দেখে একে বলা হয়ে থাকে 'সারা দুনিয়ার ভাষা (Lingua franca) অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মিশ্রিত ভাষা। গ্লোবীয় জাতিসমূহের ভাষিক ও সাংস্কৃতিক সংহতি রক্ষার ভার তাই ইংরেজিকেই বহন করতে হয় সবচেয়ে বেশি। বিবিধ ভাষাভাষী এক পৃথিবী মানুষের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ভাষিক একক হিসেবেও দেখতে গেলে ইংরেজির যুৎসই বিকল্প চোখে পড়বে না। তাছাড়া এই ভাষার বর্ণমালা ছাব্বিশটি অক্ষরের সীমানাতেই গড়ে উঠেছে সেরা সেরা সাহিত্যে-দর্শন-বিজ্ঞান-অর্থনীতি প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ডের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। তাই বলে এগুলোকে নির্বিচারে ইংরেজি ভাষার কৃতিত্ব ধরে নিলে মারাত্মক ভুল হবে। আর সব ভাষার মতোই ইংরেজিও জন্মসূত্রে একসঙ্গে সবগুলো উৎকর্ষ নিয়ে আসেনি। আধুনিক ইংরেজি যার আদিরূপ এ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষার (Anglo-saxon Language) বর্ণমালা ছিলো 'runic' অর্থাৎ রহস্যাবৃত প্রতীকধর্মী। তাই তরবারী কিংবা প্রস্তরগাত্রে নামঙ্করণের জন্যে উপযোগী হলেও তা শিল্প-সাহিত্যের ভাষা হিসেবে একেবারেই বেমানান ছিলো। পরে ছয়

মোটের ওপর গৌণ কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়া বলতে গেলে উপমহাদেশে ইংরেজি শিক্ষার পরিণাম ভালই হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের সংখ্যা কম হলেও 'নতুন ভারত' গঠনে তাঁদের অবদান মোটেও কম নয়। বস্তুত এই নব্যশিক্ষিত ভারতীয়দের নির্মোহ দিকদর্শন এবং গতিশীল নেতৃত্বের কারণেই জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে নব জাগরণের সৃষ্টি হয়, তাই সম্মিলিতভাবে উনিশ শতক রেনেসাঁ। শুধু তাই নয়, ইংরেজি শিক্ষার শিক্ষিত নয়া বঙ্গ (Young Bangla) নামের এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির ভেতরে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটলে তাই পরবর্তীতে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ নেয়। সেদিক থেকে ভারত বর্ষের স্বাধীনতায়ও ইংরেজি শিক্ষায় ধন্যাত্মক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া বহু ভাষাভাষী ভারতবাসীর মধ্যে ইংরেজি ভাষা পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের নিয়ামক হয়ে একটি ভাষিক ঐক্য গড়ে তোলে যা একটি সর্বভারতীয় জাতিগঠনে সহায়তা করে।

শতকের (A.D) শেষ দিকে রোমক মিশনারী তৎপরতার ফলে রুনিক বর্ণমালার সঙ্গে ল্যাটিন বর্ণমালার সম্মিলনে ইঙ্গ-ল্যাটিন বর্ণমালার সৃষ্টি হয়। যার ওপর ভিত্তি করে মানসম্পন্ন প্রাচীন ইংরেজি সাহিত্যের (old English Literature) সৃষ্টি হয়। এভাবে ভাষা-বিজ্ঞানের দৃষ্টি ছাড়াও চোখে পড়ে ইংরেজি ভাষার আজন্ম গ্রহণধর্মী স্বভাব। সময়ে ও সুযোগে অন্যভাষা থেকে অকাতরে গ্রহণের ব্যাপারে এই ভাষা এতোটুকুও কার্পণ্য করেনি। এবং এটাই রীতি। অর্থাৎ বলা চলে, ভাষার বিকাশে দরকার উদার গ্রহণযোগ্যতা, এবং স্বতঃস্ফূর্ত বহমানতা। দেশিক কালিক কিংবা স্থানিক বৃত্তে আটকে রাখলে ভাষা তার স্বাচ্ছন্দ্য হারায় এবং কাংক্ষিত বিকাশ লাভ করতে পারে না। শুধু তাই নয় বৃত্তাবদ্ধতা অনেক সময় ভাষাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। দৃষ্টান্ত অনেক মৃত ভাষার (Dead Language) নমুনা দেখানো যেতে পারে।

যাই হোক, ভাষা বিকাশের এই রীতিটি ইংরেজি অক্ষরে অক্ষরেই পালন করেছে। জন্মের পর থেকেই যুগে যুগে, দেশে দেশে এবং অবস্থায় অবস্থায় ইংরেজি ভাষার অবাধ সঙ্গম ঘটেছে বিচিত্র ভাষার সঙ্গে বিবিধ ভাষাভাষীর সঙ্গে। ভাষাসমূহের এই উদার মিথস্ক্রিয়া পরস্পরকে সমৃদ্ধ করেছে বিপুল মাত্রায়। আর সেই সূত্র ধরেই ইংরেজি আজ সমৃদ্ধির শীর্ষে থেকে আধিপত্য বিস্তার করছে সকল ভাষার ওপর। ভাষার আধিপত্যবাদ কিংবা আধিপত্যবাদ। ভাষা হিসেবে ভবিষ্যতে কোনো ভাষাকে সনাক্তকরণের দরকার পড়লে ইংরেজি যে সবচেয়ে আগে ধরা পড়বে তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদীদের মদদে লালিত হওয়ায় ইংরেজি-বিশ্ব-ভ্রমণেরও সুযোগ পেয়েছে সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে। সূর্যাস্তহীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদীরা ইংরেজিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে। 'যতোটুকু শিক্ষা ভয়ংকরী' ঠিক ততটুকুই শিখিয়ে তারা শোষণের রাস্তাকে রেখেছে সুগম, করেছে দীর্ঘ। উপনিবেশবাসী নেটিভদের সাম্রাজ্যবাদের মোসাহেবী করতে যতোটুকু বিদ্যের দরকার ঠিক ততোটুকু ইংরেজি বিদ্যাই দেয়া হয়েছে। এদিকে নেটিভদের ভাষা থেকে শুষে নিয়েছে সারবত্তাটুকু এবং ঋদ্ধ করেছে নিজেদের ভাষাকে। এই ছিলো উপনিবেশওয়ালাদের ভাষানীতি। সাম্রাজ্যবাদী ভাষা ইংরেজির এই কুশলী ব্যবহারকে বলা যেতে পারে 'ভাষা সাম্রাজ্যবাদ' Lingual Imperialism ব্রিটিশ কলোনীগুলোতে ইংরেজিতে ব্যবহার মুখ্যত ভাষা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়। আর সাম্রাজ্যবাদীদের নীতিই তাই। সাম্রাজ্যের বলগাহীন বিস্তারের জন্যে শুধু ভাষা কেনো, তারা তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান- শ্রেয়বোধ সব কিছুকেই ইন্সট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, যাকে বলা যায় সাম্রাজ্যবাদী ব্যবহার (imperialistic manipulation) ব্রিটিশ কলোনীগুলোতে ইংরেজি ভাষার এই ব্যবহারকে তাই সাম্রাজ্যবাদী ব্যবহার হিসেবে মনে করা যেতে পারে। শতক-শতক ধরে ব্রিটিশ-অধিকৃত কলোনীতে সাম্রাজ্যবাদের নীলনক্সা অনুযায়ী ইংরেজি ভাষা কিংবা ইংরেজি শিক্ষাকে মেনিপুলেট করা হয়েছে। আবার এই মেনিপুলেশনকে মহিমান্বিত করে ইতিহাস রচনা করা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী কালি-কলম-আর মগজ দিয়ে। সেই ইতিহাস পড়ানো হয়েছে উপনিবেশের সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে। তাই বশীকৃত মনন আর আচ্ছন্ন দৃষ্টির কারণে আমাদের চোখে কমই পড়েছে ভাষা সাম্রাজ্যবাদের মতো একটি সুক্ষ্ম চাল।

যাই হোক, সাম্রাজ্যবাদের দিন একদিন শেষ হয়েছে। সেদিন তাদের ছোড়া সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্রগুলো বুমেরাং হয়েছে। ভাষার ব্যাপারেও তাই ঘটেছে। যে উদ্দেশেই উপনিবেশে ইংরেজি চালু করা হোক না কেনো, তা পরবর্তীতে সফল হয়ে ওঠেনি। অনেকের ক্ষেত্রে আবার শাপে বর হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের সতর্ক দৃষ্টির ফোকড় গলে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বিভিন্ন উপনিবেশে। রেনেসাঁ-উত্তর, মানবতন্ত্রী পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ইংরেজি শিক্ষার হাত ধরেই ব্রিটিশ কলোনী বিশ্বে বিস্তার লাভ করে। এভাবে নেটিভদের মানব চেতনা বৃদ্ধির এক পর্যায়ে তারা স্বাধীনতার জন্যে মরিয়া হয়ে আন্দোলনে নামলে সুচতুর ব্রিটিশরাজ ন্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যান। সে যাই হোক, উপনিবেশবাসী ও উপনিবেশবাদীদের মিথস্ক্রিয়ায় (interaction) ফলে ভাষার দিক থেকে যে কেবল নেটিভরাই উপকৃত হয়েছে তাই নয়, বরং ইংরেজি ভাষাও গুনে ও মানে সমৃদ্ধি লাভ করেছে ঈর্ষনীয়ভাবে। উপনিবেশ বিশ্বকে কেন্দ্র করে প্রায় সারা বিশ্বেই বিস্তার লাভ করেছে ইংরেজি ভাষা। অন্যদিকে বিচিত্র ভাষা-ভাবনার সংস্পর্শে এসে হু-হু করে বেড়েছে এই সাম্রাজ্যবাদী ভাষার শব্দ-সাম্রাজ্য, বেড়েছে এর প্রকাশ ক্ষমতা যা একটি ভাষা সমৃদ্ধির প্রধানতম শর্ত। তাছাড়া দুনিয়াজোড়া অসংখ্য প্রতিভার হাতে পড়ে এই ভাষার চারু প্রকাশও ঘটেছে বিস্ময়করভাবে। ইঙ্গ-মার্কিন বলয়ের বাইরেও অনেক শিল্পী সাহিত্যিক কিংবা বিজ্ঞানী-দার্শনিক স্ব স্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন এই ভাষার মাধ্যমে। আর এই পরিক্রমা চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। ইংরেজি আজ অনেকের ভাষা। ব্রিটিশ ভূখণ্ডে জন্মলাভ করলেও এই ভাষা আজ বিশ্বের অনেক দেশেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় সমাসীন।

উপনিবেশ হিসেবে উপমহাদেশেও ইংরেজি শিক্ষার প্রচার-প্রসার নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। আর এই বিতর্ক মূলত দানা বেঁধেছে পরস্পর বিরোধী দুই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। উপমহাদেশ বিষয়ে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির (প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী) বিরোধ দীর্ঘদিনের। সঙ্গত কারণেই উপমহাদেশে ইংরেজি শিক্ষা নিয়েও ওরিয়েন্ট অক্সিডেন্টের মতের মিল হবে না। দু'দলেরই কট্টরপন্থীরা আত্মপক্ষ সমর্থনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে বসেন। অতএব ভাবাবেগী কট্টরত্ব পরিহার করলে এবং উদার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে উপমহাদেশে ইংরেজি শিক্ষা বিষয়ে একটা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। গবেষণামূলকভাবে সে সিদ্ধান্ত প্রমাণের অবকাশ এখানে না থাকলেও বিচ্ছিন্নভাবে এর কয়েকটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া যেতে পারে।

পশ্চিম মুল্লুকের ধ্যান-ধারণা-চিন্তা-ভাবনা অন্যান্য উপনিবেশগুলোর মতো এই উপমহাদেশে ও এসেছে প্রধানত বিলেতী ভাষার (ইংরেজি) হাত ধরেই। এভাবেই উনিশ শতকে ভারতবর্ষে পশ্চিমের ডাকেই রেনেসাঁ আসে। আর এই ডাক আসে মূলত ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই। কারণ উপমহাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার প্রসার ঘটেছে মূলত ইংরেজি ভাষাকেই বাহন করে। ভারতবর্ষে প্রতীচ্য সভ্যতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে বস্তুত ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই। এই সত্য কম-বেশি সবাই মেনে নেবে। কিন্তু সমস্যা হয় তখনি। যখন উপনিবেশওয়ালারা নিজেদেরকে সভ্যতার একমাত্র ধ্বজাধারী মনে করেন এবং সভ্যতার বিকেন্দ্রীকরণকে নিজেদের অনুকম্পা জ্ঞান করেন।। উপমহাদেশের নবজাগরণে তাদের এবং তাদের ভাষার অবদান আছে সত্য কিন্তু তাতে উপমহাদেশীদের অবদানকেও গৌন করে দেখবার উপায় কোথায়? বরং বাংলার রেনেসাঁর সিংহভাগ অবদানই এ দেশবাসীর। ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। সময়ের প্রয়োজনে, প্রগতির স্বার্থে এবং আত্মোন্নয়নের গরজেই ভারতীয়রা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের এই আকর্ষণের পেছনে পূর্ব-ভারত বণিক সংঘের (East India Company) অনুগ্রহ কিংবা করুণা ছিলো না। অথচ কলোনী-কর্তাদের কিংবা তাদের এদেশী চাটুকারদের হিসেবে ভারতীয় নেটিভদের ইংরেজি শিক্ষাদান সাম্রাজ্যবাদের পরার্থিক কর্মকাণ্ডের একটি বিশেষ দিক। শাসিতের প্রতি শাসকের রাষ্ট্রিক দায়িত্ব। আর সেই 'মহান' (?) দায়িত্ব পালিত না হলে অন্ধকার ভারবর্ষের গণ্ড ভারতবর্ষীয়রা অদ্যাবধি বনে-জঙ্গলে পশু কিংবা হাওড়-বাওড়ে মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতো। সৌভাগ্য ক্রমে 'বিশ্ব হিতৈষী' (?) ব্রিটিশরাজ 'স্রেফ' দেশ ভ্রমণে এসে উপমহাদেশবাসীর দূরাবস্থা দেখে থমকে দাঁড়ালেন এবং প্রায় দু'শ বছর ধরে তাদেরকে অন্ধকার থেকে টেনে আনলেন আলোর পথে। তারপর, সময়মতো তাদের স্বাধীনতা উপহার দিয়ে আপকাওয়াস্তে ফিরে গেলেন স্বদেশে। এদিকে অসভ্যদের হাতে ইংরেজি ভাষা তুলে দিয়ে তারা কুলীন এই বিলেতী ভাষাটির অকাল মৃত্যুকে তরান্বিত করেছেন যা সমাধিস্থ হয়েছে এই ভারত-ভূমেই। এখনও তাদের দীর্ঘশ্বাস শোনা যায় : (English was born in England, brought up in America and graved in India) অতএব, একটি উপমহাদেশে রেনেসাঁর আলো জ্বালাতে ইংরেজি ভাষাকে মরণের ঝুঁকিও নিতে হয়েছে। কট্টর পাশ্চাত্যবাদীরা তো সেরকমই বলেন। কিন্তু আসলে কি তাই? অবশ্যই না। এই ধরনের একপেশে মূল্যায়ন প্রবল ইঙ্গ-প্রীতির নামান্তর। আর এই ধরনের একপেশে উপনিবেশবাদী মূল্যায়নের দিন ফুরিয়ে এসেছে। এডওয়ার্ড সাইদ প্রমুখের প্রাচ্যবাদী ভাবনা

এর পর ১১-এর পাতায়

উপমহাদেশে ইংরেজি শিক্ষা

৯-এর পাতার পর

ঔপনিবেশিক চিন্তাধারাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। সভ্যতার পাদপীঠ হিসেবে প্রতীচ্যকে নিয়েও প্রশ্নের ঝড় উঠেছে। ওরিয়েন্ট যে এতোকাল সভ্যতার জগতে শুধু ভিক্ষাবৃত্তি করেই বেঁচে আছে— এই ভাবনাকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওরিয়েন্টেরও অক্সিডেন্টকে দেয়ার অনেক কিছুই ছিলো এবং আছে শুধু এই তার হিসেব। তাই আজ নতুন করে হিসেবের খাতা খোলা হয়েছে। কড়ায়-গণ্ডায় আজ বুঝে দেয়া-নেয়া হবে যার যার প্রাপ্য। উপনিবেশের খাঁচায়। গিনিপিগ হিসেবে দীর্ঘদিন বন্দি থাকায় আমরা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম আমাদের আত্মমর্যাদা, গৌরবোজ্জ্বল অতীত, প্রগতিমুখী বর্তমান আর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু সেই বিস্মৃতির কাল কেটেছে মোহমুক্তি (disillusion must) ঘটেছে প্রাচ্য বিবেকের। সেই সূত্র ধরেই উপমহাদেশে ইংরেজি শিক্ষা নিয়েও নতুন ভাবনা শুরু হয়েছে। এদেশে ইংরেজি শিক্ষা কি অন্যের অনুগ্রহের না-কি নিজেদের আগ্রহের ফসল? রবীন্দ্রনাথ কি বাধ্যতামূলক ইংরেজি শিখে এবং লিখে নোবেল পেলেন, না-কি ইংরেজিতে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে? রামমোহন বিদ্যাসাগর বঙ্কিম-মধুসূদন কি কলোনীকর্তার চাটুকারী করতে ইংরেজি শিখেছেন কিংবা শিখতে বলেছেন, না-কি দেশের সত্যিকার উন্নতি চেয়েছেন? এইসব জিজ্ঞাসার সদুত্তর পেতে হলে বসতে হবে নতুন মূল্যায়নে। আর সে মূল্যায়ন শুরুও হয়েছে ভিন্ন-ভিন্ন আঙ্গিকে। আর সে মূল্যায়নের সুবিধার জন্যে সংশ্লিষ্ট ইতিহাসের দিকে একটু চোখ বুলানো যাক।

উপমহাদেশে ইংরেজি শিক্ষার আবির্ভাবের পূর্বে অর্থাৎ ১৮ শতকে মোগল আমলের শেষ দিকে দু'ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রচলিত ছিলো। প্রথম ধরনে ব্রাহ্মণ বালকদের জন্যে সংস্কৃত স্কুল, যেখানে ধ্রুপদী আইন, সাহিত্য এবং ধর্মশাস্ত্র, এবং মুসলমানদের জন্যে আরবী পারসিক ও ইসলামী ক্লাসিক পড়ানো হতো। দ্বিতীয় ধরনে অ-ব্রাহ্মণদের জন্যে আঞ্চলিক ভাষায় গণিত, সাহিত্য এবং হিসাব ও পত্রলিখন শেখানো হতো। ধ্রুপদী ও পেশাদারী শিক্ষা মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের নাগালের মধ্যে ছিলো। এক কথায় সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা বলে কিছু ছিলো না। তাছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নীতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট না থাকায় কোম্পানি আমলের প্রথম দিকে, অর্থাৎ ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়তে থাকে। এমনকি উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতেও শিক্ষার মান হ্রাস পেতে থাকে। এর প্রধান কারণ কোম্পানি আমলের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং সরকারি সহানুভূতির অভাব। যাই হোক, বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে এক সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই নতুন মধ্যবিত্ত সমাজে হিন্দুরাই ছিলো সংখ্যাগুরু। এদের ভেতরেই প্রথমত প্রতীচ্য ভাষা সাহিত্য-চিন্তাধারা সম্পর্কে জানাশোনার এক তীব্র আকাংক্ষার উদ্ভব হয়। এদিকে ইংরেজ বেনিয়া ও দেশী মানুষদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপনের জন্যে দো-ভাষী, কেরানী ও নকল নবিশের প্রয়োজন দেখা দিলে এ দেশবাসীর জন্যে ইংরেজি শিক্ষা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে ১৭৭৪ সালে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠা হলে বিচার সংক্রান্ত কাজের জন্যেও বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন আরও বড়ো হয়ে দাঁড়ায়। প্রসঙ্গত রামরাম মিশ্র নামে জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত রামনারায়ণ মিশ্রের নাম পাওয়া যায় যিনি সুপ্রিম কোর্টের এক উকিলের কেরানী হিসেবে প্রচুর আয় করেন। এই রামনারায়ণ মিশ্রই সর্বপ্রথম বাঙালি যুবকদের ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের জন্যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, রুটি- রোজগারের প্রয়োজনেই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির ভেতরে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়। তাই অনেকে মনে করেন যে, নিছক একদল কেরানী সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই সাম্রাজ্যবাদী সরকার এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিক এই অভিমতকে সত্যের অপলাপ বলে মনে করেন। ডঃ মজুমদারের মতে ইংরেজদের সাহায্য ছাড়াই এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়। বস্তুত ১৮৩৫-এর পূর্ব পর্যন্ত সরকারের ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি ছিলো না। আরও একটি জিনিস স্পষ্ট হলো যে ভারতবর্ষীয়দের ভেতরে বাঙালিরাই সর্বপ্রথম ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয় এবং পুরো উপমহাদেশের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার পাদপীঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বন্দর নগরী কলকাতা। মুক্ত মননের ও সুদূর প্রসারী আলো চাইছিলেন। তাই তারা পাশ্চাত্য মুক্তবুদ্ধির জগতকে স্বাগত জানাতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন যা সম্ভব ছিলো কেবলমাত্র ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে।

ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই ইউরোপ তথা প্রতীচ্য বিশ্বের সমৃদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য ভারতবাসীকে প্রণীত করেছিলো, সন্দেহ নেই। তাই একটি ঐতিহাসিক লক্ষ্যের পরিপূর্ণতার জন্যে, মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষা ও শিক্ষার পঠনপাঠন ও চর্চা নিঃসন্দেহে কেবল করণিক হওয়ার উদ্দেশে নয়। যাই হোক ইংরেজি শিক্ষা আন্দোলন ক্রমাগত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে উপমহাদেশ বাসীদের সবাইকে কমবেশি নাড়া দেয়।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতায় ইউরোপীয়দের তৎপরতায় ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্যে বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শেরবোর্ন নামে এক ইউরোপীয় জোড়াসাঁকোতে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়েই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, (রবীন্দ্রনাথের পিতামহ) প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বাঙালি প্রথমবারের মতো ইংরেজি বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত হন। আমড়াতলায় মার্কিন বোল নামে আরেকজন ইউরোপীয় আরেকটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন বাংলার খ্যাতিমান ব্যবসায়ী ও মানবতাবাদী মতিলাল শীল এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই সকল বিদ্যালয়েই বাঙালিদের তথা উপমহাদেশীদের ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার হাতে খড়ি হয়।

বাঙালিদের ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে খৃষ্টমিশনারীদের অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে নিজেরা বাংলা শিক্ষা করেন এবং বাঙালিদের ইংরেজি ও সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য বিদ্যাও সেখান। এদের মধ্যে উইলিয়াম কেরীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কেরী বাংলায় আসেন এবং শ্রীরামপুরে খৃষ্টধর্ম প্রচার শুরু করেন। তিনি মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড নামে আর দু'জন মিশনারীর সাহায্যে শ্রীরামপুরে খৃষ্টধর্ম প্রচার শুরু করেন। তিনি মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড নামে আর দু'জন মিশনারীর সাহায্যে শ্রীরামপুরে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় ও একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। সেই সময় মনিটরিয়াল পদ্ধতি (উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র দ্বারা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের পাঠন) প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করায় শ্রীরামপুরের মিশনারীরাও এই পদ্ধতি অবলম্বন করে বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮১৭ সালে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হাইড ইস্ট ও বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হলে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার দ্রুততর হয়। ইংরেজি ছাড়াও এই কলেজে অন্যান্য ভাষার চর্চা হলেও এর মূল লক্ষ্য ছিলো ছাত্রদের ভেতরে পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক মননের সৃষ্টি করা, যে কারণে ইংরেজ শিক্ষাই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এই দিক থেকে উনিশ শতকের নবজাগরণেও হিন্দু কলেজের অবদান অনস্বীকার্য। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ যে সকল বাঙালি প্রতিভাকে। এই কলেজ সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজ নারায়ণ বসু, কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় অন্যতম। বস্তুত হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হলেই উপমহাদেশে প্রথমবারের মতো আধুনিক পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শুরু হয়। এই কলেজই পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ নামে পরিচিত হয়। যাই হোক, এই ধরনের উচ্চ ইংরেজি মহাবিদ্যালয় সংখ্যা বাড়তে থাকলে উপমাহাদেশে ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপকতা বেড়ে যায়

১৮১৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে সনদ পায় তাতে ভারবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্যে এক লাখ টাকা বরাদ্দ হয়। কিন্তু উপমহাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা নিয়ে গোড়াপন্থী প্রাচ্যতন্ত্রী (orientalist) এবং কট্টর এ্যাংলিসিস্টদের ভেতরে দ্বন্দ্ব শুরু হলে সরকার বরাদ্দকৃত অর্থব্যয় বন্ধ রাখেন। পরে ১৮২৩ সালে সরকারের একটি কমিটি কোম্পানির ডাইরেক্টর সভায় সিদ্ধান্ত নেন যে উক্ত এক লক্ষ টাকায় স্থানীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের সরকার চাকরিতে নিয়োগের উপযোগী শিক্ষা দেয়া হবে। কিন্তু মিশনারী স্কুলে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একজন সচেতন ভারতীয় হিসেবে রাজা রামমোহন রায় এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ভারতে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের জন্যে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন এবং এর পেছনে সরকার বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করার দাবি জানান। খৃষ্ট মিশনারীরা তাকে সমর্থন দেন। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে জনশিক্ষা কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। লর্ড মেকলে ও আলেকজান্ডার ডাফ পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্যে সরকারি অনুদান ব্যয়ের সপক্ষে রায় দেন। পক্ষান্তরে ফোলব্রুক, প্রিন্সেপ প্রমুখ সদস্যবৃন্দ প্রচলিত প্রাচ্য শিক্ষা বিস্তারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এদিকে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি মেকলে তার প্রখ্যাত স্মারকলিপিতে (Memorandum) ভারতীয় শিক্ষার নিন্দা করে ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার সুপারিশ করেন। যাইহোক, জনশিক্ষা কমিটির সদস্যরা বিবাদটি নিষ্পত্তি করতে না পেরে তা তৎকালিন গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিংকের হাতে ছেড়ে দেন। বেন্টিক ছিলেন একাধারে পাশ্চাত্যবাদী এবং উপযোগবাদী (utilitarian) দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষাকে তিনি সব রকমের উন্নতির চাবিকাঠি মনে করতেন। তাছাড়া, কিছুটা বিষয় বুদ্ধিও তার মধ্যে কাজ করেছিলেন যে, ইংরেজ কর্মচারিদের ভারতীয়দের তুলনায় অনেক বেশি আর্থিক সুবিধাদি দিতে হতো বলে প্রশাসনে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীদের নিয়োগ করলে তা সরকারের পক্ষে অধিক লাভজনক হবে। এইরকম নানা উপযোগীবাদী ভাবনা বেন্টিংকে মেকলের প্রস্তাব সমর্থন করায় এভাবে একদিকে রামমোহনের চলমান আন্দোলন অন্যদিকে বেন্টিংক মেকলের উদার উপযোগবাদী সিদ্ধান্তের কারণে অবশেষে ১৮৩৫ সালে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি সরকারিভাবে গৃহীত হয় এবং ইংরেজি শিক্ষার বিকাশও ত্বরান্বিত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, উপমহাদেশে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা যতোটা না ঐচ্ছিক, তারচেয়ে বেশি ব্যাবসায়িক। তাই প্রধানত আর্থিক কারণেই সরকার এদেশে যেনতেন রকমের ইংরেজি শিক্ষাদানের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। ব্রিটিশদের ভেতরে কেবল খৃষ্ট মিশনারীরাই কিছুটা আন্তরিকভাবে এদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষা দিতে চেয়েছেন এবং তার প্রমাণও রেখেছেন। আর ইংরেজি কিংবা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আন্তরিক ও আগ্রহী ছিলো এদেশবাসী নিজেরাই। রামমোহন প্রমুখ নেতাদের প্রগতিশীল নেতৃত্বে এদেশের মানুষের সচেতন অংশ পশ্চিমের গতি-প্রগতির শিক্ষা ভারত ভূমিতে আনবার জন্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত হয় এবং দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি সফল রেনেসাঁর সূচনা করে। তাই বেন্টিঙ্ক, মেকলে প্রমুখের সদিচ্ছা না থাকলে যে উপমহাদেশে ইংরেজি শিক্ষা আসত না তা বলা যাবে না। সেক্ষেত্রে হয়তো সময়টা একটু বেশি লাগতো। উপমহাদেশের রেনেসাঁ ছিল কালের এক অনিবার্য পরিণতি। ইটালীয় কিংবা ইউরোপীয় রেনেসাঁ যেমন আকস্মিকভাবে কোন বিশেষ কর্তৃপক্ষের আদেশে আসেনি, এসেছে কালের চক্রে, অবস্থার প্রয়োজনে, বাংলার রেনেসাঁও তেমনি ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক আদেশে আসেনি, বরং এসেছে কালিক পরিণতি হিসেবে, চেতনা বিকাশের পথ ধরে। বিভিন্ন মানবিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। আর বাংলার এই নবজাগৃতির পেছনে ইংরেজি শিক্ষার প্রত্যক্ষ অবদান আছে।

মোটের ওপর গৌণ কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়া বলতে গেলে উপমহাদেশে ইংরেজি শিক্ষার পরিণাম ভালই হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের সংখ্যা কম হলেও 'নতুন ভারত' গঠনে তাঁদের অবদান মোটেও কম নয়। বস্তুত এই নব্যশিক্ষিত ভারতীয়দের নির্মোহ দিকদর্শন এবং গতিশীল নেতৃত্বের কারণেই জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে নব জাগরণের সৃষ্টি হয়, তাই সম্মিলিতভাবে উনিশ শতক রেনেসাঁ। শুধু তাই নয়, ইংরেজি শিক্ষার শিক্ষিত নয়া বঙ্গ (Young Bangla) নামের এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির ভেতরে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটলে তাই পরবর্তীতে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ নেয়। সেদিক থেকে ভারত বর্ষের স্বাধীনতায়ও ইংরেজি শিক্ষায় ধন্যাত্মক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া বহু ভাষাভাষী ভারতবাসীর মধ্যে ইংরেজি ভাষা পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের নিয়ামক হয়ে একটি ভাষিক ঐক্য গড়ে তোলে যা একটি সর্বভারতীয় জাতিগঠনে সহায়তা করে।

অতএব উপমহাদেশে ইংরেজি শিক্ষা যে কেবল ছা-পোষা কেরানী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছিল,-তা যেমন ভুল, এখানে ইংরেজি ভাষা সমাধিস্থ হয়েছে-তাও তেমনি ঠিক নয়। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, জওহর লাল নেহরু, মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, সৈয়দ আমীর আলী, নবাব আব্দুল লতিফ প্রমুখ যশস্বী-মনস্বী ভারতীয় ইংরেজি শিক্ষায় অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছেন। কই, ইংরেজি শিক্ষা তো এঁদের কেরানী বানায়নি। বরং পাশ্চাত্য শিক্ষা এঁদের মধ্যে যে রিফর্মেশনের বীজ ঢুকিয়ে গেছে, তারই ফল আজ আমরা ঘরে বসেই পাচ্ছি। আর, উপমহাদেশে ইংরেজি ভাষা যে সমাধিস্থও হয়নি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো ইন্দো-এ্যাংলিকান সাহিত্য (Indo-Anglican Literature)। এই সাহিত্য হলো ভারতীয় সাহিত্যিকদের ইংরেজিতে রচিত সাহিত্যকর্ম। সমকালিন তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্যে (Third world literature) ইন্দো-এ্যাংলিক্যান সাহিত্য একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। সাম্প্রতিককালের জীবিত ইন্দো-এ্যাংলিক্যান সাহিত্যিকদের মধ্যে নীরদচন্দ্র চৌধুরী, আর, কে, নারায়ন, অনিতা দেশাই, সালমান রুশদী, বিক্রম শেঠ প্রমূখ আধুনিক বিশ্ব-উপন্যাস সাহিত্যে বেশ দাপটের সঙ্গেই চলাফেরা করছেন। এঁদের কয়েকজন আন্তর্জাতিক মাপের পুরস্কারও পেয়েছেন। একজনের তো (আর কে নারায়ণ) একসময় নোবেল পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও কানা-ঘুষা হয়েছিল। তবু নোবেল না পেলেও ইংরেজি চর্চায় এঁদের হাত যে ভাষাটিকে সমাধিস্থ করার হাত নয়-তা অন্তত বিশ্বের অনেকেই স্বীকার করবে।